প্রেতচ্ছায়া

কিন্নর রায়

প্রেত কহিল, এই স্থলে তাহার মর্টার দাগিয়াছিল।

ঘনীভূত হরিয়ালি বক্ষে ধারণ পূর্বক অরণ্য স্থির। নবজলদাগমে, বরিষণ ঋতুতে যেমত হইয়াছিল, এক্ষণে বন-চিত্র আদপেই সেরূপ নহে। শীত অথবা প্রাক শীতল ঋতু মুহূর্তে বনানী কিছু বা রিক্ত। শূন্য সবুজে পত্র মর্মর শ্রবণ করিতে হইলে অতিরিক্ত কর্ণপাতের প্রয়োজন নাই।

পাতা ঝরিতেছে।

পাতা ঝরিতেছে।

পত্র পতন ঘটিয়া চলিতেছে।

প্রেত স্বভাবতই কৃষ্ণবর্ণ। যেরূপ মহাকাব্যের যুগ হইতে হইয়া আসিতেছে। রাক্ষস, পিশাচ, অপদেবতা, প্রেতযোনী — সকলেই সর্বাংশে ঘোর কালিময়।

কেন?

ইহার পশ্চাতে কি কোনো রূপ সামাজিক চৈতন্য, সমাজ বিকাশের ইতিহাস ও ধ্যান ধারণা কর্ম করিতেছে! রাক্ষসের গাত্র বর্ণ কৃষ্ণ হইবে। কারণ ইহাই স্বাভাবিক চিন্তা। শাস্ত্র, পুরাণ, নানা কাব্য মতানুযায়ী শবর, নিষাদ সহ সমগ্র অনার্যরাই কালো বরণ সুতরাং প্রেত ও রাক্ষস তাহারা ঘোর কালোই হইবে।

প্রেত এক নহে।

একাধিক।

জনৈক প্রেত কহিল, উহারা স্কুল বাড়ির সম্মুখ হইতে আমাকে বলপূর্বক উঠাইয়া লইয়া যায়। তাহার পর গণ আদালত। মনুষ্য নামক এক প্রাণীর অবধারিত মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা ও উহার পর তাহা কার্যকর করিবার নিমিত্ত উহা এক ছুতা মাত্র।

খুন হইবার পর যাহাকে খতম করা হইল তাহা দেখিবার লোকজন ক্রমে এসে জুটিয়া যায়। লাশের পাশে রক্ত। রক্তের ধারা পার্শ্বে রক্তলিপিতে লেখা পোস্টার —মাওবাদ জিন্দাবাদ। পুলিশের চর সখা হেমব্রম ও মলিন টুডুকে গণ আদালতে বিচারের পর চরম শাস্তি দেওয়া হল।

প্রথম প্রেত যে কিনা যৌথ বাহিনীর মর্টার দাগার কথা বর্ণনা করিতেছিল ও মর্টার গোলায় প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া শালবৃক্ষ শাখে ঝুলিয়াছিল, তাহার জিনস প্যান্ট, কেডস জুতা, টি শার্ট, জ্যাকেট — সবই সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে, বরে সদা দৃশ্যমান। এক্ষণে আর কিছুই গোপন নাই। যাহা গোপন, তাহাই পাপ। অথবা যা গোপনে রাখা যায়, সবই পুণ্য। এমন কোনো আঁশ কথা পাঁশ কথা তাহার পূর্বে শ্রবণ করিয়াছে বলিয়া একেবারেই মনে হয় না।

প্রেতের শার্ট লাগে না। প্রেতের প্যান্ট পরিধানের কোনোরূপ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাহার অবয়ব কুয়াশাময়, আবছা, রহস্যমণ্ডিত। গভীর আবছায়ার ভিতর হইতে কেবল তাহার দুইটি কালান্তক চক্ষু জাগিয়া থাকে। ধক ধক করিয়া জ্বলে। গগনপটে যেমত লুব্ধক।

প্রেতের পাদুকার প্রয়োজন নাই। ফলত যে কেডস জোড়া মিডিয়া দৃশ্যমান করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে, তাহার প্রতি হয়ত আকর্ষণ রহিয়াছে। কিন্তু ব্যবহার করিবার ক্ষমতা নাই। কেডস যুগল, কেডসরা বিচ্ছিন্ন হইয়া এখানে ওখানে, তাহাদের নিচে ঝরা পাতা, সবুজ ঘাস — শ্যাম শষ্প। যদিচ হিন্দু শ্রাদ্ধে পুরোহিতকুল প্রেতকাজের দ্রব্যাদি লিস্টি করিবার সময় অবশ্যই ছত্র ও প্রযোজন 'ঝাটা' অথবা ব্র্যান্ডেড নামী পদঢাকনা। বাঁশে লাশ বাঁধিয়া জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসে যৌথ বাহিনী। বিজয় চিহ্ন স্বরূপ বংশ গাত্রে লটপটান হস্তের কিশোরী অথবা প্রাক যুবতী।

এমন কি তৎসহ কিশোর ও যুবক। তাহাদের ঘাড় এক পার্শ্বে ঘড়ির কাঁটা যেরূপ সময় চিহ্ন, দিক নির্দেশ হারাইয়া বাঁকিয়া স্থির হইয়া থাকে ঘড়ির যন্ত্র খারাপ হইয়া যাইবার পর, এক্ষণে চিত্ররূপ তেমনই।

ছয় ছয়টি লাশ।

তাহার ভিতর দুইটি কিশোরী অথবা যুবতীর।

বাঁশের গায়ে রক্ত।

প্রথম প্রেত চিৎকার করিয়া উঠে আমার— আমাদিগের বল বাড়িল। আরও নূতন নূতন দোসর আসিতেছে।

বনস্থলী স্থির।

বাতাস স্তব্ধ।

বারুদ গন্ধে সমগ্র বনানী দম বন্ধকর নাৎসি গ্যাসচেম্বার।

বাতাস ফিস ফিস কণ্ঠে জানিতে চাহে ইহার কোনো রূপ প্রয়োজন ছিল?

বাতাস সামান্য বিরক্ত হইয়া বলিতে থাকে — এই রূপ প্রদর্শনের বাঁশে বাঁধা নিহত শরীর দরকার কী! অরণ্যের প্রাচীনতম বৃক্ষটি সম্মুখে সামান্য ঝুকিয়া কহিতে থাকিল, পূর্বে রাজা - মহারাজা, জমিদার, নবাব - সাহেব, রায়বাহাদুর, রায় সাহেব, খান বাহাদুর, খান সাহেবরা ব্যাঘ্র, লেপার্ড, গুলবাঘ, বন্য বরাহ, চিতা মারিবার পর, তাহাদিগকে ট্রফি করিত বাঁশে ঝুলাইয়া—

বাতাস কহিল, তাহা হইলে ইহার ভিতর আদিম শিকার ভাবনাই কার্য করিল। দীর্ঘ বংশপ্রান্তে লাশ ঝুলিতেছে। দুলিতেছে রক্তাক্ত রঙিন সালোয়ার - কামিজ, জিনস প্যান্ট, টিশার্ট নগ্নগাত্রে ভোরের প্রথম কিরণ। বাতাস হায় হায় করিয়া বলিল, আহা, কোন

মায়ের বুক খালি হয়ে গেল গো! হায় হায় হায় —

তেমনই আধপাকা স্কুল বাড়ির সামনে গতিময় মোটর সাইকেল। দুচাকা গতিশীল রাখার মোটরের ভয়াবহ ভটর ভটর, ভট ভটর শব্দ, একটা বাইকে দুজন। এমন করে চারটে বাইক। গ্রামের লাল ধুলো ওড়ান পথে। মোরাম পড়েনি। দূরে নির্জন শাল জঙ্গল। আরও আরও দূরে আবছা মতো অযোধ্যা পাহাড়। টুরগা, বামনি।

এ কাহিনি কি বলরামপুরের?

এ কাহিনি কি মালদার?

এ কাহিনি কি সারেঙ্গার?

গ্রামের মাস্টার মশাই ধুতি-শার্ট।

গ্রামের মাস্টার মশাই রোজ দাড়ি কামান না।

গ্রামের মাস্টার মশাই চল্লিশ - পঁয়তাল্লিশ।

গ্রামের মাস্টারমশাই টুডু, বাস্কে, হেমব্রম, নয়ত সিং সর্দার।

মোটর বাইকে একজন শ্যুটার একজন - স্পটার।

শ্যুটারটি অতীব শার্প স্যুটার। তাহার হাতের টিপ অব্যর্থ। স্পটার দেখাইয়া দিবে— ঐ ব্যক্তিটি মনুষ্য নহে, শ্রেণীশত্রু। উহাকে খতম করা শ্রেণী সংগ্রামের অঙ্গ। উহাতে 'বিপ্লব' ত্বরান্বিত হইবে। 'মাওবাদ' প্রসার লাভ করিবে।

স্কুলের সামনে শরৎ শেষের রোদ্দুর।

স্কুলের ছাদে শালিকদের কলতান।

বিদ্যালয়ের উঠোনে জোড়পায়ে শালিকদের নিজস্ব খুনসুটি।

তখনই গুলির শব্দ। এক নয়, একাধিক। তাহার পূর্বে মোবাইলে মোবাইলে হনন কথা বিনিময় হইয়া গিয়াছে।

প্রথম ক্লাসটি নেওয়ার পর নিরস্ত্র মাস্টারমশাই পেচ্ছাপখানার দিকে যাচ্ছিলেন। ততক্ষণে ওরা স্কুল চত্বরে ঢুকে পড়েছে।

এই বিদ্যায়তনে তেমন করে সীমানা পাঁচিল গাঁথা হয়নি। আজও। গ্রামের মোরগ-মুরগি, ছাল - ভেড়ারা অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে তার চৌহদ্দির ভেতর।

এ গল্প বলরামপুর, কাঁটাডি, মিডি, শালবনি, ঝাড়গ্রাম, মেটলা, সারেঙ্গা, কিংবা অযোধ্যা পাহাড়ের। গল্প তো ডানা ছড়াতে ছড়াতে এগোয়।

সিং সর্দার খুন করে সিংসর্দারকে।

বাস্কে খুন করে বাস্কেকে।

টুডুর হাতে খতম হয় টুডু।

হেমব্রম মারে হেমব্রমকে।

কিসকু কিসকুকে ছাড়ে না।

মাহাত গুলি করে মাহাতকে।

এরই নাম শ্রেণী সংগ্রাম?

এরই নাম শ্রেণী যুদ্ধ?

এ সব কি ক্লাস ওয়ার, না কি কাস্ট ওয়ার?

জঙ্গল থেকে অপারেশান শেষ করে বেরোয় যৌথ বাহিনী। তখন আকাশের মাথায় বিপুল স্তনবতীর ঐশ্বর্য নিয়ে জেগে থাকা চাঁদ ও হঠাৎই কি এক আতঙ্কে যেন ক্ষীণচন্দ্র। দৃশ্যমান মঙ্গলগ্রহটি কবেই মুছে গগনপট মঞ্জরী থেকে। স্তনদুগ্ধ রঙের জ্যোৎস্না, তুলা অথবা বৃশ্চিকরাশি তৈরি করা নক্ষত্রমণ্ডলী, ঠ্যাং ফাঁক করা কালপুরুষ মহিম সবই অস্তমিত সৌন্দর্য।

রাতের যে প্রেতবাসর তা ক্ষণবিরতিতে। আরও খানিক সময় চলে গেলে যখন সূর্য উঠে আসবে আকাশের প্রান্তরেখায়, তখন সিঁদুর ভরা ডগডগে সিঁথি যেন এমন অতি পুরাতন, বহু ব্যবহৃত ক্লিশে উপমায় প্রাচীন আকাশকে দেখতে দেখতে পাখিরা নিজস্ব কলতানে গাইতে শুরু করার অনেক পরে গুলির শব্দ শোনা যাবে। সেই সঙ্গে বারুদের ঝাঁঝাল গন্ধ। তারই পাশাপাশি মোটর - সাইকেলের রোল।

নইন এম এম, একে ফর্টি সেভেন বেজে উঠবে ঝনন ঝন। সেই সঙ্গে মাওবাদ জিন্দাবাদ, দিকে দিকে দালাল খতম চলছে চলবে।

সেই বুক ছ্যাঁদা করা আগুন আগুন বস্তুটি খুব কাছ থেকে দেগে দেওয়ার পর ভেতরে ঢুকে যে যন্ত্রণার নাচ তৈরি করতে থাকে, তা সহ্য করা কঠিন। কিন্তু যে খুন হয়, তার তো সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো অধিকার থাকে না। খুব সহজে, সেই পদ্ধতি তো নির্দিষ্ট হয়েই থাকে, যেমন নিয়তি। পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তে খতমের পদ্ধতি বাইরের পাতা হয়েই জেগে তাকে। যার ভেতর ছাপা আছে সর্বস্ব। কিন্তু উল্টোদিকে যে খুন হবেই তার মতামত নিয়ে কেমন করে খুন হব— এই বিষয়ে তো কিছু ঠিক করা হয় না।

ফলে শিক্ষকমশাই গুলি খেয়ে পড়ে গেলে শেষ কথা হিসেবে মাওবাদ জিন্দাবাদই শোনেন। তাঁর বিস্ফারিত দু চোখের সামনে তখনও কিছুদিন আগে জ্বলে যাওয়া পার্টি অফিস, লাল পতাকা, পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচি, দেওয়াল থেকে জোর করে নামান কাচবন্দি লেনিন, স্তালিন— টিভি ক্যামেরার সামনে স্বাস্থ্যবান গোঁফ সহ সামরিক পোশাক, ওয়ার মেডেল, ধাতব নক্ষত্র শোভিত জোসেফ স্তালিন , সেই জর্জিয়ার নেতা, লেনিন-স্তালিনের কাচে আগুনের নিজস্ব ছায়া ছবি।

ছাত্র, ছাত্রীরা — যারা দূর দূর থেকে পড়তে আসে, যারা তাদের এই শিক্ষা - বন্ধুটিকে ভালোবাসে, তারা অনেকেই যেন গুলির শব্দ, রক্তের রেখা, যেমন স্বভাবে গড়িয়ে নামে মাথা, বুক থেকে — আইজ্যাক নিউটন ভ্যাগ্যিস আপেলের পতন দেখেছিলে

গাছের ডাল থেকে, তাই তো মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব, রক্তের গড়িয়ে নামা দেখে তাঁর মনে কি গ্রাভিটেশান থিয়োরির উদ্‌গম হত ? হত কী !

কে জানে !

সে তো হয়ত জানে মহাসময়।

নয়ত বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানও কি সব কিছু জানে ! সলভ করতে পারে ?

রক্তের ধারা গড়িয়ে নামছে। এখানে — মানে এই হন - ছায়ায় ঢেকে যাওয়া স্কুলের ছাদে, বারান্দায়, কার্নিশে গোলা পায়রার ঝাঁক থেকে না, না হলে একটা পপুলার ফিল্ম শট, সেই যে 'অপরাজিত' থেকেই হয়ত হয়ে আসছে, সেই যে সত্যজিৎ শটে কাশীর ঘাটের পায়রারা হরিহরের পরান পক্ষির সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যায়, তা দেখতে দেখতে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্ত উচ্চারণে— 'কী হল ! কী হল —' এটুকুই শুধু হয়ত, তখন কে যে অপু— অপূর্ব কুমার রায়কে তার বাবার মুখে গঙ্গাজল দিতে বলে, কোথাও কোথাও তো দুধ- গঙ্গাজল দেওয়ার রীতি, সেখানে এলিয়ে পড়া কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, চক্ষু যাঁর শিবনেত্র—সর্বজয়া বুঝতে পারে কাল এসে গেছে, তারপরই মৃত্যুর সঙ্গে — পরানপাখি পালিয়ে যাওয়ার ক্ষণটিকে সেলুলয়েড - মহিমান্বিত করতে গোলা পায়রার ঝাঁকের উড়ে যাওয়া, বহু ফিল্মি প্রতীকেই কিন্তু এখানে — এই বিদ্যায়তনে তো কবুতরেরা নেই। ফলে পারাবতের বিকল্প যে হলুদ ফ্রেমের চশমা আঁটা, গম্ভীর, সদা ব্যস্ত শালিকেরা, যারা কলকাতা বা তার আশপাশের শালিকদের থেকে সাইজেও খানিকটা বড়, হয়ত ঢালাও প্রকৃতি, রোদ, সবুজ ইত্যাদি প্রভৃতির জন্য, তো সেই শালিকরাও গুলির শব্দ বেশ কয়েক বছর ধরেই হজম করে আসছে, তার জন্য অভ্যাসে মিশে যাওয়া এই আওয়াজে তারা কিন্তু তেমন করে ভয় পেয়ে উড়ে গেল না। একটু দূরে সরে গিয়ে তারা দেখতে থাকল বাস্কে মুর্মু, টুডু, হেমব্রম, কিসকু, মাঝি অথবা সিং সর্দার নয়ত ঘাটোয়াল টাইটেলের এই শিক্ষকের মাথা না কি পা কোনটা বেশি ধরফড় করতে থাকে গুলি খাওয়ার পর।

বুলেট বিঁধে গেলে সামনে অপার শূন্যতা।

শরীরে গুলি ঢুকলে তখন এক নিদারুণ যন্ত্রণা শুধু। তারপর পা কাঁপতে থাকে। মাথা, সর্ব শরীর। এরপর থাকে শুধুই শূন্যতা। হিম শূন্যতা। অন্ধকার আর নৈঃশব্দ।

মাস্টারমশাইকে গুলিতে ভুনে দিলে ছাত্রী আর ছাত্রদের মুখে ফুটে উঠতে থাকে কেমন যেন এক বোবা নিঃসঙ্গতা। খানিক দূরে সালবন, তার সবুজ মায়া, জঙ্গলের ভেতর নীল সাদা হলুদ পলিথিন শিট — তাঁবু, তাঁবু। বিপ্লবের আঁতুড় ঘর। স্টোভ, হাঁড়ি কুড়ি, চাল, চা-পাতা। গেরস্থালির নানান খানা।

রাতে যে পাহারায় ছিল, থাকে — মানে সেই গার্ডকে ওভার পাওয়ার করতে কতক্ষণ লাগে ! বর্ষা ফুরিয়ে যাওয়া অরণ্যে তখন তো পাতা ঝরার গানই শুধু। ন্যালাখ্যাপা সেই ছেলেটি, যে কি না জঙ্গলের ধারে শেষ রাতে হাগতে গিয়েছিল, তার পেট সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে নেমে যাওয়ার আগেই যৌথবাহিনীর কোনো লৌহমুঠি তার ঘেটি ধরে ওপরে তুলে ধরে।

ঘাসের গায়ে ছড়িয়ে যাওয়া নরম মলের শেষটুকু, তার যাবতীয় দুর্গন্ধ নিয়ে ন্যালাখ্যাপার পায়ে জড়িয়ে যায়। অন্ধকারে ঘাস পোকারা স্থির। সাদা, নয়ত রঙিন প্রজাপতিরা জেগে ওঠার প্রতীক্ষায়। বৃক্ষের আবডালে চন্দ্রহীন আমাবস্যা।

বাহিনীর কে একজন ন্যালাখ্যাপর এ হেন গুয়ে মাখা অবস্থা দেখে আন্দাজে বলে ওঠে, শালে টাট্টি ফিরতা।

ন্যালাখ্যাপা হাউমাই করে। তার ভাষা স্পষ্ট ভোঝা যায় না। কথার সঙ্গে সঙ্গে নাল ভাঙে। বাহিনীর কঠিন হাত তার চোয়ালে একটি ঘুষি মারে। —গন্দা শালে—

ন্যালাখ্যাপার প্রবল ভয় হয়। সেই আতঙ্ক তার পুরুষাঙ্গটিকে কুঁকড়ে আরও ছোট, জাপ্পু, তরাসে মরা চড়াই পাখি করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে পেচ্ছাপের নতুন স্রোত অসাড়ে, নিঃসাড় প্রবাহে ঘাস ভূমিকে ভরিয়ে দেয়।

মুততা শালে — মুততা। গর গর করে ওঠে অবাঙলির উর্দি।

হাগতা হ্যায়, মুততা হ্যায়। যৌথ অভিযানে থাকা বাঙালি ইউনিফর্ম বলে ওঠে।

ন্যালাখ্যাপা, ধরা যাক তার নাম সখারাম মুর্মু। সখারাম না হয়ে তার নাম সাহেবরাম অথবা সানি মুর্মু হতে পারে। নয়ত পিন্টু মাহাত। দিকুদের নাম আজকাল — বেশ কয়েক বছর হল এদিকে খুব চলে।

এখানেই আখ্যানকারের মাথা টিপ টিপ। বুক ধড়ফড়। গলা শুকিয়ে কাঠ। সে শালা শহুরে কলমবাজ। তার লেখায় এখন তো খুব দরকার কথোপকথনের। আর এমন চরম ক্লাইম্যাক্সে ডায়লগ মানেই তো ডায়লেক্ট।

আখ্যানকর্তা শহরের লোক। শহুরে বলতে অবশ্য তার ঠিকানা শহরের। কিন্তু চৌপর দিন, চব্বিশ ঘন্টা তার চলাফেরা, ঘুরে বেড়ান পশ্চিমবাংলা শুধু নয়, সারা ভারতবর্ষের নানা কোনা খামচিতে। এই যে আখ্যানকারী, সে তো কোনো অঞ্চলেরই তেমন অর্থে 'ভূমিপুত্র' নয়। ফলে সে লোধা, শবর, ভূমিজ, সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, ঘাটোয়াল, মাহাত, সহিত— তথাকথিত 'প্রান্তিক', কোট আনকোট 'ব্রাত্য', মারজিনালদের মুখের ভাষা জানে না। এ এক সমস্যা বিশেষ। বার বার ঠাঁই নাড়া হতে হতে কখনও অখণ্ড বঙ্গের পূর্ববঙ্গ, কখনও বিহারের পূর্ণিয়া সাহেবগঞ্জ, কখনও বা হাওড়া হুগলি, নয়ত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া হয়ে প্রায় মধ্য বয়সে সে তো কলকাতায় থিতু। এই শহর তাকে কোল দিয়েছে। তার জন্য এই নগরের কাছে তার কৃতজ্ঞতার কোনো শেষ নেই। আর কেন জানি না বারে বারে তার ইদানীং এমনটাই মনে হয় নাগরিক মনন না হলে আখ্যান, কবিতা নির্মাণই শুধু নয়, ভালো ছবির আঁকা, ফিল্ম মেকিং, নাটক অভিনয় করা ও লেখা, প্রবন্ধ রচনা — কোনোটাই বাস্তবে সম্ভব নয়, গ্রামের যাত্রা, কবিগান, তরজা, আখড়াই, হাফ আখড়াই, লোটো, টুসু, ভাটিয়ালি, জারি, সারি, গম্ভীরা, ফসল বোনা ও কাটার গান, আলকাপ— সব ঠিক আছে। এসবই অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সংস্কৃতি মাধ্যম। কিন্তু নগরই দেয় আখ্যানের রূপক ও বর্ণনা সম্ভার। ভাষার নিজস্ব চলন।

ফলে এই আখ্যানকারের পরিচিত অন্য অন্য 'ভূমিপত্র' 'জন' 'গণ', দীর্ঘ তিরিশ - চল্লিশ বৎসর কলিকাতা বাসের সঙ্গে সঙ্গে কমোড, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ইমেল, মোবাইল মেসেজ, রিংটোন সহ 'ভূমিপুত্র'ই রহিয়া গিয়াছে। মাল্টি ন্যাশানালের

পেস্টে দন্ত ধাবন করিয়া, বহুজাতিকের হাত - ক্ষুরে দাড়ি কামাইবার পর, বহুজাতকেরই আফটার শেভ, তাহার পর বহুজাতিকের সাবান — তবুও তাহারা 'ভূমিপুত্র'।

কেহ চল্লিশ, কেহ বা পঞ্চাশ বর্ষ পূর্বের লোধা জানিত, সাঁওতাল দেখিয়াছিল, শবর, মুণ্ডা, ভূমিজ তাহাদের স্মৃতিতে বেশ ক ববছর যাবত বাণিজ্যকাঙ্ক্ষী। সেই সব কথাবার্তা, ডায়লেক্ট, বহুজাতিকের বহুবিধ ফেনা যেমত, তেমনই সফেন। ফলে 'ভূমিপুত্র' হিসাবে গাঁ ঘরের সেই ডায়ালগ ও ডায়লেক্ট একদা বোম্বাই — বর্তমানে মুম্বাই ফিল্মের নব্য সেলিম জাভেদ সংস্করণ।

এই আখ্যানের নির্মাতা বট্যে, লারব, তুয়ার ইত্যাদি প্রয়োগে তাহার কাহিনিটিকে আরও মাটি ঘেঁষা, আরও অধিক গ্রাস রুট ছোঁয়া করিতে না চাহিয়া মান্য বাংলাতেই, যে রূপ বাংলা কলিকাতার সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন ব্যবহার করে, সেই ভাষা —যাহা বিদ্যসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, মানিক, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ প্রমুখ তৈয়ারি করিয়াছেন, এই পথ নির্দেশিকা অনুসরণ করিয়া চলিতে চাহিতেছে।

পাহাড়ের চার পাশ বেড় দিয়া কুম্বিং শেষে, জঙ্গালপথ অতিক্রম করিয়া অতি সন্তর্পণে রাষ্ট্ররক্ষকরা ফিরিয়া আসিতেছে। যদিও বর্তমানে সূর্য আকাশে। প্রভাত হইয়াছে। জাগরিত রবিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিহগকুলের কল - কাকলিও অতীত ছবি হইয়া স্থির।

বাহিনী মাইন হইতে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া শিবিরে ফিরিতেছে। বনের আড়াল, পাহাড়ের উপর হইতে আচমকা ছুটিয়া আসা গুলির আতঙ্কে দাঁতে দাঁত চাপিয়া রাস্তা ফুরাইতেছে। রুটিন রুট মার্চ, ফ্ল্যাগমার্চ,রুটিন তল্লাশি, চিরুনি তল্লাশি-সকলই এখন খবরের কাগজে হেডিং যেমত, তেমনই নিত্যরিত।

প্রেতগণ মহিষের পিঠে আরোহণপূর্বক চলাফেরা করে। কুক্কুর ও মহিষ প্রেতদর্শন করিতে সক্ষম। অশরীরী বা তাহাদের সম্মুখে আত্মগোপন করিতে পারে না কোনো মতেই। গভীর নিশীথে, চন্দ্রমা শূন্য আকাশ পটে অথবা চন্দ্রলোকিত, জ্যোৎস্না সুরভিত নিশিতে সারমেয় কুল ও শমনবাহন মহিষ, প্রেতযোনী অবলোকন করত আর্তনাদ করিয়া উঠে।

সমর সন্তান সন্ততিদের ভৌ-উ-উ-উ-উ, নির্জন যামিনী মধ্যে প্রবল তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে চাহে। তাহারা অনেকেই মস্তিষ্কোপরি চন্দ্রলোভাতুর আকাশ দেখিয়া আপন খেয়ালে ডাকিতেছে, অনেক সময় এমন মনে করিবার পরও গৃহস্থ কি এক আপন আতঙ্কে আরও গুটিসুটি মারিয়া যায়।

জীবন্ত মহিষ পৃষ্ঠে জীয়ন্ত প্রেত। প্রেতের দুই চক্ষু, কখনও কখনও বা লোচনের পরিমাণ তিন, যাহার ভিতর একটি কপালের উপর বসিয়া ধক ধক ধক ধক করিতেছে। চতুষ্পার্শে ঘোরা নিশি।

মেটলার জঙ্গলে যে বা যাহারা নিহত হইয়াছে যৌথ বাহিনীর মর্টার, গুলিতে, শিলদার ই এফ আর ক্যাম্পে যে যে ই এফ আর জওয়ান প্রাণ দিয়াছে, মাইনের তুমুল বিস্ফোরণে যে পুলিশ কর্মী ও নার্স, ডাক্তাররা জীবন হারাইয়াছে, আর একই সঙ্গে স্কুল শিক্ষক, পঞ্চায়েত কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী — যাহারা কেহ পুলিশের চর, কেহ বা মাওবাদীদের নিকট পুলিশের গতিবিধির সংবাদদাতা হিসাবে নিহত হইয়াছে, তাহারা প্রতিজনেই মোষের পিঠে, কুকুরের সওয়ারি।

ভারতীয়, হিন্দু বিশ্বাসে কুকুর কালভৈরবের বাহন। কিন্তু এক্ষণে প্রেত বহন করিতে করিতে তাহারা ক্লান্ত। তাহাদিগের পিঠে যথেষ্ট ব্যথা-বেদনা।

মিডিয়ার জঙ্গলমহল বনধে বনধে স্তব্ধ। ব্যাঙ্ক খোলে না। পোস্টাপিস, স্কুল, কলেজ, বাস গুমটি, রেল স্টেশন, স্টেশন মাস্টারের কেবিন, টিকিট বিক্রির ঘর — সবই আতঙ্ক হিমে জমিয়া গিয়াছে।

ন্যালাখ্যাপা যেমন, তেমন মাঠ ফিরতে আসা কেউ কেউ বাহিনীর কবলে পড়লে, তার তো জীবন তথাগত। বুনোশুয়োর, নেকড়ে, লেপার্ড, শেয়াল, সাপ, ভূত-প্রেত-দানা-দত্যি— সর্ব বিপদের উপর রহিয়াছে পুলিশ বিপদ। সেই যে কথায় বলে না — 'শমন দমন রাবণ রাজা/ রাবণ দমন রাম ... ।'

কে কাহাকে দমন করিবে !

দমনের ফলাফল জানিবে কে বা কাহারা ?

ভারী বুটের লাথিতে ন্যালাখ্যাপা ওরফে সাহেবরাম ওঁক করে ওঠে। 'ওঁক' এই আর্তনাদের কোনো আদিবাসী প্রতিশব্দ হয় ? লোধা, ভূমিজ, সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, মাহাত, কুর্মি, ঘাটোয়াল, সিংসর্দার, সহিদ রাষ্ট্রের পদাঘাতে আচমকা জর্জরিত হইলে 'ওঁক' —এই চাপা শব্দটি তুলে আপাতত স্থির থাকতে হয়।

বন্দুকের নল শেষ রাতে ঠাণ্ডাই থাকে। আকাশের চাঁদ অনেকক্ষণ ধরে পৃথিবীর গায়ে, মুখে ফোকাস মেরে বসে থাকার পর ক্লান্তিতে হাই তোলে। তারপর হঠাৎই সাহেবরাম, নয়ত সানির বাঁ দিকের রগে, কানের ঠিক ওপরে রাইফেলের নল ঠেকানোর ছবি দেখতে পেয়ে প্রচণ্ড জোরে বিষম খায়। শশীশোবার এই শ্বাস আটকান শব্দে উড়ে যেতে থাকে আকাশের মেঘেরা।

তারপর সাহেবরাম নতুন করে পেচ্ছাপ করতে থাকে অসাড়ে। কিন্তু ভেতরে ব্লাডারে স্টক তো তেমন নেই। ফলে ফোঁটা ফোঁটা ফোঁটা— তার বেশি তো দেওয়ার ক্ষমতা নেই তার পুং-যন্ত্রের, কিন্তু ত্রাসে, জীবন থাকবে কি থাকবে না —এই ভয়াবহতার টানাপোড়েনের সে তো এক রকম জ্ঞানহারা হয়েই যায়।

বজ্রমুঠি তাকে ছাড়ে না। হিড় হিড় করে টানে। এস এল আর এর নল ছুঁয়ে থাকে রগে। সেই ইস্পাত-হিম শীতলতার ভেতর কত কত হাজার বছরের সংস্কার — হয়ত এবার আমি সত্যি সত্যি মরে যাব আর বাঁচব না — ভাবতে ভাবতে তলপেটে নিজের অজান্তেই আরও খানিকটা চাপ দিয়ে ভড় - ভড়িয়ে নিজকে খানিকটা মুক্ত করে ন্যালাখ্যাপা।

শালা টাট্টি করাত হ্যায় টাট্টি করতা হ্যায় — পাখানা কর দিয়া। — চাপা গলায় বলতে থাকে লোহার হেলমেট, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, মাথায় কালো ফেট্টি ভারী বুট। সবুজ জংলা ছাপা ডাংরির কেউ কেউ নিঃশব্দে তাকায়। তারার আলোর নিচে নিঃশব্দ

জঙ্গল। দূরে কোথাও জোনাকিরাও নেই, এমনই নিকষ অন্ধকার। কাছে, আশেপাশে, এণন কি খানিক তফাতেও ঝিঁ ঝিরা কোনো শব্দ করে না। সময় তাদের মুখে সেলোটেপ লাগিয়ে দিয়েছে।

বাঁশে বাঁধা যে ছ ছটি লাশ, তাদের মধ্যে দুজন যুবতী অথবা কিশোরী বাকিরা পুংলিঙ্গ, এই যে কন্যেরা, যারা বুকে গুলি নিল, যাদের স্তন শোভায় হয়ত বুলেটের পুড়ে যাওয়া খোঁদল, কীসের থেকে কী হয়, সে তো পোস্ট মর্টেমই বলতে পারে কেবল, এখনও তো তাও বলে না, যদি রাষ্ট্র না চায়, সোখানে লাশ কাটা ঘরের ভেতর দম চাপা মড়া পচা গন্ধ মেখে, নিজেরাও একসময় পচা মড়া হতে হতে, তারাও তো 'আন ক্লেমড ডেড বডি'। —এইসব মৃতদেহের কোনো দাবিদার নাই, এমন এক গূঢ় রহস্যরেখা গায়ে মাথায় মুখে মেখে নিয়ে নিঃশব্দে ফুলে যেতে থাকে।

মৃত শরীর ফুলতে ফুলতে দু গু তিন গুণ। দেহরস গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। পায়ের কড়ে আঙুল কেটে দিয়ে দ্রুত পালায় ধেড়ে ইঁদুর। হাতের বুড়ো আঙুল কাটার জন্য তার তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। চোখ খুবলে খাওয়া হয়ে গেছে বহুদিন আগে। সার বাঁধা পিঁপড়েরা দেহ রসের ম্যাপ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আবারও চোখের মণি যেমন, তেমন নরম-সরম কিছু খোঁজে।

হায় মেয়ে, তার নাম কী শোভা মান্ডি!

তোর তো এখন কলেজে পড়ার সময়।

বিয়ের বয়স।

শহুরে আখ্যানকার ভাবে এখানটায় শোভার বাবা পচা মান্ডি, মা লক্ষ্মীমণি মাণ্ডির একটা জীবন, একটু ছোট করে যদি দিতে পারতাম, শহরে বছর চল্লিশ বাস করা, কমোডে হাগা 'ভূমিপুত্র লেখকের' কায়দায়, তাহলে কত না হাততালি জুটত।

আহা, কত না সংবেদনশীল প্রান্তিক মানুষ সম্বন্ধে।

ভূমিপুত্রজি কত কত গবেষণা করেন এই জীবন নিয়ে।

গ্রাম বাংলা তথা গ্রাম ভারতকে তিনি আবিষ্কার করলেন নতুন করে।

প্রায় হাজার চল্লিশ মাস মাইনে পাওয়া নিশ্চিন্ত জীবনের ভূমিপুত্র আদিবাসী জীবন আঁকে। এই জায়গাটায়, মর্গে শুয়ে থাকা মেয়ের পিঁপড়ে খাওয়া ইঁদুর খুবলোন শরীরের পাশে সে নিশ্চয়ই একটা বিয়ের গান, কিংবা টুসু - ভাদুর কোনো এক ছেঁড়া কলি বসিয়ে নিজেকে 'প্রান্তজনের'র সখা' ভেবে 'ভূমিপুত্র' -র যে আহ্লাদ, তা তো এই আখ্যানকারের হয় না। সে বরং ভাবে কন্যেটির বাড়ির উঠোনে জেগে থাকা সেগুন গাছটির কথা, যা তার বাবা নয়, ঠাকুর্দা লাগিয়েছিল কন্যের বিহার খরচের জন্য।

জ্যোৎস্নায় গোটা চারেক নবীন সেগুন অবনত। মুরগির খোঁয়াড়ের বন্ধ দরজার সামনে অনন্ত স্তব্ধতা। ঘরের দাওয়ায় নিকোন অন্ধকার। ঘরের দাওয়ায় মুছে যায় চাঁদ।

খবর দেয় রাষ্ট্র।

খবর পাঠায় গোপন সংগঠন।

জঙ্গলের গভীরে শহিদ বেদির পাশে জ্বলে ওঠে মশাল। লাল ব্যানারে লেখা পার্টির নাম। ভুল শ্লোগানে শ্লোগানে দিকভ্রান্ত হিংসার পুনরাবৃত্তি শপথ।

শহিদ শোভা মান্ডি তোমায় ভুলছি না, ভুলব না।

ভুলছি না, ভুলব না।

একই ভুল চাঁদ লুটোপুটি করতে পারে না শহিদ বেদির ওপর। শোকে তার মুখ কালো। যেমন শোভা মাণ্ডির ঘরের মাটির দাওয়ায় আলো পৌঁছতে তার লজ্জা লাগে।

সবুজ সবুজ উর্দি। একে ফিফটি সিকস, এস এল আর -এর ঝকঝকে নল। সঙ্গে থ্রি নট থ্রি রাইফেল। ডবল ব্যারেল, সিঙ্গল ব্যারেল বন্দুক। পি এল এ — পিপলস লিবারেশান আর্মি। গণ মিলিশিয়া গণফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকে না।' মাও-সে-তুঙ।

কোথায় গণফৌজ, কোথায় গণভিত্তি? বন্দুকের নলের মুখে ভয় দেখিয়ে গ্রামবাসীদের থেকে তোলা আদায়/খাবার, অর্থ, আশ্রয়।

বনের বাতাস কাতর স্বরে বলল, এতো কাম্বোডিয়ার সেই পল পট রেজিম। সত্তর দশকে যা আতঙ্ক তৈরি করেছিল। চার পাশে শুধু খুলির পাহাড়, টিলা, মানুষের হাড়, খুলি আর খুলি। নরকপালের মহোৎসব। একটু সন্দেহ হলেই খুন। নির্বিচার হত্যা। মনহীন, হৃদয়হীন সন্ত্রাস। সত্যিকারের বধ্যভূমি— 'কিলিং ফিল্ডস'।

শহিদ বেদির গায়ের চাঁদের আলো পড়ে না। অন্ধকারে শহিদ স্তম্ভ আরও আঁধারমাখা। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে চলে যায় সাপেরা। সেইসব বুকে হাঁটাদের কেউ কেউ আঁকড়ে, পেঁচিয়ে ধরতে চায়, শোভা মান্ডি বা আরও কারও কারও স্মরণে তৈরি হওয়া স্মৃতি বেদি।

সবুজ সবুজ উর্দিরা নিজেদের ইউনিফর্মকে জঙ্গলের ক্যামোফ্লেজে মিশিয়ে দিয়ে বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে। অনেক অনেক শ্লোগান উঠতে থাকে আকাশ কাঁপিয়ে।

...অমর রহে অমর রহে...।

...অমর রহে অমর রহে...।

...লাল সেলাম লাল সেলাম।

মেঘলা অন্ধকারে চাঁদ লুকোয়। সম্পূর্ণ আড়ালে যায় চন্দ্র শোভা।

পুলিশ মর্গে শোভা মান্ডির অফিসিয়ালি আন আইডেন্টিফায়েড লাশ ফুলতে থাকে। ক্রমশ ফোলে। তার নাখ, মুখ, কান, হাত, হাতের আঙুল ফেটে ফেটে শরীর রস গড়ায়। মৃত মাংসের গন্ধে গন্ধে ঘুরে বেড়ায় ধেড়ে ইঁদুর, পিপিলিকা বাহিনী। ফৌজি

ডিসিপ্লিনে তারা রুট মার্চ করতে থাকে খাদ্যের আশায়, আশায়।

শোভা মাণ্ডির জন্য কোনো বিবাহ সঙ্গীত নেই।

শোভা মাণ্ডির জন্য কোনো মারাং বুরুর থান, পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়ির কাহিনি অবশিষ্ট থাকে না। হড়- মিতান সংস্কৃতি, সেই অলৌকিক ডিম পাড়া কুহকি হাঁস, ভাদু- টুসুর গান — সব মুছে গেছে এস মাণ্ডির জীবন থেকে।

এস মাণ্ডি বা শোভা মাণ্ডি এখন একটি লাশের নম্বর মাত্র।

শোভা মাণ্ডির কোনো স্কুল অথবা কলেজ নেই।

তার জন্য থাকছে না কোনো প্রেমিতের হতাশ শ্বাস।

শোভা মাণ্ডি এখন লাশ মাত্র।

পিঁপড়েরা অনায়াস রুট মার্চে দখল নিতে চায় শোভার শরীর। বলিষ্ঠ মূষিক নিজেদের গেরিলা ট্যাকটিকসে খুবলে নিতে চায় আরও আরও মাংস, অনেকটা খাবার। শোভার উঠোনের সেগুন গাছ আপন মনে কাঁদে। খোঁয়াড়ের মোরগ - মুরগিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে এরকম ঠিক করেই নেয় এবাড়ির মেয়ে আর ঘরে ফিরবে না।

গুলিতে উল্টে পড়ে মুহূর্তে 'শ্রেণী শত্রু' হযে যাওয়া মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী কাঁদে। মা বুক চাপড়ায়। বাবা কেমন যেন স্তব্ধ পাথর। টি ভি চ্যানেলের চোঙা মাস্টার মশাইয়ের বাবাকে ধরার চেষ্টা করে। বাবা মাইকের সামনে হ্যালব্যাল করতে করতে কত কী বলে । সে সব কথার সঙ্গে তার শূন্য দৃষ্টির যোগফল জন্ম দেয় আরও গভীরে, গভীরতর কোনো শূন্যতার।

টি ভি চ্যানেল চোঙা মাকে কিছু বলাতে চায়। ক্যামেরার সামনে কী বলবে মা ! তার শিক্ষক, রোজগেরে পুত্র — ছেলের ঘরে দুটি কচি কচি প্রাণ - ননা, বড়টি মেয়ে, সাত। ছোটটি ছেলে তিন।

'শ্রেণীশত্রু'র মাটির উঠোনে ছোট ছেলেটি খেলে। তার মাথায় ন্যাড়া। অপঘাত মৃত্যুর শ্রাদ্ধ নিয়মমতো তিন দিনে হয়ে গেছে।

টি ভি ক্যামেরা তার চ্যানেলের পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড ও পলিসি অনুযায়ী এখানে ওখানে ধরতে থাকে। নিহত মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী কোনো কথা বলতে পারেন না। খুন হওয়া স্বামীর জন্য তাঁর লেন্স ফাটান হাহাকার আকাশের উড়ো পাখিদেরও হয়ত সতর্ক করে দেয়।

স্বামীটি শেষবার কবে তার তামাটে স্তনে হাত রেখেছিল। কবে এজীবনের অন্তিম চুম্বন রেখাটি এঁকেছিল ঠোঁটে, গালে ! অথবা অন্য কোথাও। মেয়েটির কি এইসব কিছু মনে পড়ে গেল জীবন-মৃত্যুর দোলায় দুলতে দুলতে !

মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রীর চোখের জল ঝাপসা করে দিতে থাকে ক্যামেরার যন্ত্র -আঁখি। যে শালিকেরা সেদিন সাক্ষী ছিল শিক্ষমমশাইয়ের নিধন চিত্রের, তাদের কেউ কেউ ক্যামেরার অনেকটা সামনে বেদম সাহসে ভর দিয়ে এগিয়ে এসে বলতে লাগল, আমাদেরও কিছু বলার আছে। আমাদের কথা শোন। কিন্তু তাদের পক্ষিভাষা বুঝবে কে ! ফলে শারি ও শারিকারা তেমন করে পাত্তা পেল না টিভিঅলাদের কাছে।

লেন্স -এর অনুসন্ধান পর্ব বরং খুঁজে নিতে চাইল বিদ্যায়তনের সেই সব ছাত্রী আর ছাত্রদের, যারা কেউ কেউ তাদের প্রিয় শিক্ষককে খুন হয়ে যেতে দেখেছে। সেই ছাত্রী আর ছাত্ররা এমন ভাবে খুন অভিযান দেখার পর অনেকেই যাকে বলে একেবারে বোকা বনে গেছে। বোকাদেরও তবু কোনো কথা থাকে কখনও কখনও। এই সব ছাত্রীদের, ছাত্রদের মুখে তেমন করে কোনো কথা নেই। অন্তত টিভি চ্যানেলের ডাণ্ডার সামনে তার মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।

ইহারা 'কিলিং ফিল্ডস' দেখে নাই।

ইহারা কাম্বোডিয়া, কাম্পুচিয়া, পল পট, খেমেররুজ, লননল, প্রিন্স নরোদম সিহানুক— কাহারাও নাম শুনে নাই। ইহারা জ্ঞাত নহে প্রিন্স নরোদম সিহানুক চীনে পলাইয়া গিয়াছিলেন। ইহারা অবগত নহে পল পট রাজত্বে কাম্পুচিয়ায় হাড় ও খুলির পাহাড়, টিলা গজাইয়া উঠিয়াছিল। গলায় লাল রুমাল বাঁধা গণমিলিশিয়া, তাহাদের হস্তে অতীব সফিসটিকেটড অত্যাধুনিক রাইফেল ও পিস্তল। ইহা ছাড়া প্রচলিত দেশি কাতান ইত্যাদি রহিয়াছে। এই সকল দিয়া ক্রমাগত রক্তস্নান। হনন প্রক্রিয়া। খুন।

কাহাকে সামান্যতম বিরোধী মনে হইলেই তাহাকে আমেরিকান এজেন্ট, সি আই এ বলিয়া হুমকি, আক্রমণ, নিধন।

দিন যায়।

পুলিশ মর্গে লাশ ফুলে ওঠে।

সময়ের চাপে পুলিশ মর্গের লাশ পচে ঢোসকা হয়। এই সব লাশের দাবিদার থাকে না কোনো। তবে মামলা হতে থাকে লাশের দখল নিয়ে। হাইকোর্ট, লোয়ার কোর্ট।

মাংসাশী মর্গ-মূষিকেরা শোভা মাণ্ডির মাংস - স্বাদ নিতে নিতে কথা বলে নিজেদের মধ্যে

ধেড়ে ইঁদুর — এর মাংস বড় নরম

সেমি ধেড়ে ইঁদুর— হবেই তো, শত হলেও মেয়ে মাংস। নারীখণ্ড এমনিতেই বেশি তুলতুলে।

ধেড়ে— কট্টরা নারীবাদীরা এসব শুনে রেগে যেতে পারেন।

সেমিধেড়ে - যদি ওঁরা রেগে ওঠেন, তাহলে আমার তেমন করে কিছু করার নেই।

ধেড়ে - দেখো বাবা, সামলে সুমলে—

মর্গের অন্ধকার আরও ঘন, ঘনীভূত হতে থাকে। কাক, কুকুর, পিঁপড়ে, ইঁদুর, মৃত শরীরের দেহাবশেষ — সব মিলিয়ে এ যেন এক ঘুলিয়ে ওঠা জীবন্ত নরক।

নরক কথা বলে।

জাহান্নামের দূতেরা কথা বলতে থাকে।

হেল গার্ডসরা চকচকে চোখে তাকায়।

হিন্দুর নরক, মুসলমানের জাহান্নাম, খ্রিস্টানের হেল — সব তো আলাদা আলাদা। সেপারেট। যেমন স্বর্গ, জান্নাত, হেভেনও, সম্পূর্ণ পৃথক একে অন্যের চেয়ে।

মরে গেলে কী হয়?

মৃত্যুতেই কী সব শেষ?

মর্গের আবছা শীতলতা আর প্রবল ভ্যাপসানির ভেতর (একটি নিছক) নম্বর মাত্র হয়ে যাওয়া এস মাণ্ডি নরকেরই প্রহর গোনে। গুনতে থাকে। নরকের নানা ঋতু।

প্রবল জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসে।

রোদ্দুরে উত্তরোল হয় সমস্ত চরাচর।

লাশ পড়ে থাকে চুপচাপ।

লাশ থেকে যায় অন্ধকারে।

লাশের তো বয়স বাড়ে না।

লাশ হয়ে গেলে একই বিন্দুতে থেমে থাকে বয়স।

ও কন্যে, তোর বিয়ের গান

ও কন্যে, তোর আইবুড়ো বেলার শখ

ও কন্যে, তোর পুতুল খেলার বেলা

ও কন্যে, তোর সরল সিধে মেয়েবেলা

ভুল সত্য বুকে নিয়ে কন্যে ঘুমোয়

ইঁদুরেরা জাগে।

জেগে থাকে অন্ধকার।

পিঁপড়েরা জেগে থাকতে চায়। তাদের অবিরাম কুচকাওয়াজ লাশকাটা ঘরের মেঝেয়, টেবিলে।

মাস্টারমশাইয়ের যে খুব তার প্রত্যক্ষদর্শী ছোটরা, কচিরা, একেবারে বোবা হয়ে যায়। তাদের মুখে রা ফোটে না।

চল্লিশ বছর শহরে বসবাস করা 'ভূমিপুত্র লেখক' কোনো গান বসাতে পারে কি মৃত শোভা মাণ্ডির মুখে? যে শোভা মাণ্ডি এনকাউন্টারে স্পট ডেড হয়ে যায়, তার জন্য কী কোনো গান তোলা থাকে ভূমিপুত্র হিসাবে দাবি করা আখ্যানকারের কাছে?

সুবর্ণরেখায় তখন দুপুর রোদের ছায়া

সাইকেল ঘাড়ে তুলে শীতের সুবর্ণরেখা পেরয় এপার ওপার করা মানুষ।

হিন্দুস্থান কপারের আবর্জনা, বর্জ্য মেশে সুবর্ণরেখার জলে।

কালো কালো পাথরের চুমু খায় জল। ওপার —পাহাড়ের দিক থেকে নেমে আসে মোষেরা। কালো কালো, স্বাস্থ্যবান মহিষ ঘাস চরে ফিরছে। তাদের মুখের কোণে সবুজ কুটি। শিঙে সূর্যের মথিত আলো।

এসব কথা কি শোভা মাণ্ডির মনে পড়ে তার বুকে গুলি বিঁধে যাওয়ার আগে। রাইফেল পিঠে নিয়ে নদী এপার ওপার করা। যথেষ্ট শারীরিক সামর্থ না থাকলে কোনো ভাবেই রাইফেল, এস এল আর কাঁধে জল পেরিয়ে, রাষ্ট্রের কড়া নজরদারি এড়িয়ে এপার ওপার করা যায় না।

তখন শেষ রাতের কুয়াশা মাখা চাঁদ মুচকি হাসে। তারপর বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস নামায়। হিন্দুস্থান কপারের বেলজ্জ আলো ফ্যাটফেটিয়ে তাকিয়ে সামনে সামনে। সেই আলো - ছবি সুবর্ণরেখার জলে। পাথরের গায়ে গায়ে, খাঁজে। নৈর্ব্যক্তিক আকাশ কি এক অলীক আশা নিয়ে চুলকে দেয় জলের গা, গাল। মানুষ পারাপার করার সময় যে জলতরঙ্গ ওঠে নদীতে, সেই সঙ্গে শব্দ কল্লোল, বন্দুকধারী ওপারে ওপারে যাওয়া- আসা করলে ধ্বনি স্বভাবত কিছু ভিন্নতর।

আকাশ অবাক বিস্ময়ে রাইফেলধারী নারীদের দেখে। সেই সঙ্গে কালো কালো নদী - পাথরেরাও তাকিয়ে থাকে সবন্দুক নারী ও পুরুষের দিকে।

জঙ্গলে, গভীরতর অরণ্যে, হলুদ, সাদা পলিথিন তাঁবুর আড়ালে কখনও কখনও নিবিড়তর হয় শরীর। তখন তো শরীরে ধর্মেই জাগে শরীর। ডিম্ববতী ইলিশ যেমন ডিম ছাড়তে আসে নোনা জলে ছেড়ে মিঠা জলে। তারপর মিষ্টি জলেই তো তার মরণ। পাতার শয্যায়, খড় - প্লাস্টিক শয়ন - ঘেরের ওপর অবাধ্য মন। নষ্ট শরীর। দেহেতে দেহ ঘষা খায়। তখন কী মনে জাগে? ন না জাগরিত হলে জাগে শরীর?

কবে থেকেই তো স্বপ্ন বোনা হয়েছে রেড করিডোর-এ। একেবারে নেপাল থেকে শুরু করে বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবাংলা, ওড়িশা, অন্ধ্র, ছত্রিশগড়, দণ্ডকারণ্য হয়ে লিবারেটেড জোন। সেই সব উত্তাল এলাকা চিহ্নিত করণের জন্য নানা রং। রঙের বাহার।

লাল। হলুদ। সবুজ।

অভ্যাসে ঠোঁট চলে আসে ওষ্ঠ রেখার কাছাকাছি। গাল ছোঁয় কপোল। এই শরীর সমঝোতার সময় কোথায় থাকে এস এল আর, ইনস্যাস, একে ফর্টি সেভেন।

ক্যাম্পে আমাদের ক'জনের ওপর রীতিমতো—

মিডিয়া লেখে — যৌন শোষণ, যৌন নির্যাতন।

কথাটি ভদ্র কিন্তু যথেষ্ট সুড়সুড়ি দায়ক।

জঙ্গলে দিনের পর দিন পাশাপাশি বসবাসের পরও শরীরে শরীরে চকমকি বিদ্যুৎ। সেই সঙ্গে স্কোয়াড কমান্ডার, স্কোয়াড সদস্য, পলিটব্যুরো, সেন্ট্রাল কমিটি—সকলেরই বয়স বেড়ে যায়। জঙ্গলের পর জঙ্গল। নতুন নতুন গেরিলা জোন। তাই জঙ্গল আর ফুরোয় না।

অন্ধ্র থেকে হিংসা যায় ইন্দ্রাবতীর পারে। দণ্ডকারণ্যে শোনা যায় বন্দুকের গর্জন। বিস্ফোরক ঠাসা মাইনদের ফেটে ওঠার গর্জন - বিলাপ।

হত্যা। হত্যা। হত্যা। নির্বিচার হত্যা।

মৃত্যু। মৃত্যু। অবিরত মৃত্যু মিছিল।

সন্দেহ হলেই খুন। সামান্যতম সংশয় ডেকে আনে জীবনের শেষ অঙ্ক। হত্যার যুক্তি সাজাতে গণবিচার, গণ আদালত। গণ মিলিশিয়া।

পথ ডেকে নেয় চৈতন্য।

চৈতন্য, বোধি জন্ম দেয় নিঃসঙ্গতার।

জঙ্গল গ্রাস করে মনকে। শরীরকে তো বটেই। পাখির ডাক, হাতিদের চলাফেরা, শেয়ালের পদধ্বনি, পাতাদের বাঁচা মরা, উই ঢিবির ভাঙা ও গোটা অস্তিত্ব — সবই তো চিহ্নিত হয়ে থাকে গোপন জঙ্গল জীবনের। এই গোপনীয়তায় প্রথম প্রথম এক আশ্চর্য রোমাঞ্চরেখা। তারপর ভয়, আতঙ্ক। যখন মর্টারের গোলা এসে উড়ে পড়ে। যখন চলতে থাকে চিরুনি তল্লাশি। যখন সংখ্যায় বাড়তে থাকে প্রেতরা।

শিলদা ক্যাম্পে নিহত ই এফ আর জওয়ানটি প্রেত হওয়ার পর তার অধ পোড়া এস এল আর, রক্তভেজা ইউনিফর্ম খুঁজে বেড়ায়। সকাল - সন্ধ্যা সর্বক্ষণই তার মনে পড়ে পাহাড়ের কোলে ছোট্টগ্রাম। সেখানে তার বাড়ি। মা, বাবা, বৌ। একটা মেয়ে, দুটো ছেলে।

ফ্যামিলি অ্যালবামে বেঁধে রাখা রঙিন ছবিরা ক্রমশ বিবর্ণ। তার ভেতর থেকেই একটি ইউনিফর্ম পরা, মাথায় টুপি সমেত ছবি এনলার্জ করাবার পর কাচবন্দি হয়ে মালা, চন্দন পরে। পোড়া ধূপ কাঠির ধোঁয়া ও ছাই একই সঙ্গে দেখতে দেখতে সুগন্ধের থারাও বুঝতে পারে, হয়ত।

তার বৌ পেনশনের জন্য ঝগড়া করে। জঙ্গলে তাকে সেন্ট্রাল কমিটি, পি এল এ, পি এল জি, পলিট-ব্যুরো, বিপ্লব সমর বিশেষজ্ঞ— সকলেরই জ্বর, পেট খারাপ হয়। সি ডি তে সিনেমা দেখার ইচ্ছে জাগে। সেখানে চালু থোকে কম্পিউটার, কখনও ল্যাপটপ। ছোট জেনারেটরের আলো।

জঙ্গল চেতনাকে গ্রাস করে।

মানবতার চৈতন্য নিয়ে তাই অরণ্য - বেশ থেকে বেরনো হয়ে ওঠে না।

তারপর আছে রাষ্ট্রের মার, তল্লাশি।

পাতা ও সবুজের নিভৃতে শরীর শরীরের অভ্যাস পালন করে। যেমন গাছ, যেরকম আকাশ, আলো, নদী, স্ব - স্ব - স্বভাবে। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল। সেলফোনে নতুন নতুন সিমকার্ড। কাউকে খুন করলে তার সিমটি বাজেয়াপ্ত হয়। তারপর চলে থাকে তার ঢালাও ব্যবহার।

কোনো কোনো পাবলিক বলে, পুলিশ অ্যাত পারে অত পারে আর মোবাইলের সিগন্যাল দেখে ধরে ফেলতে পারে না সেন্ট্রাল কমিটি, পলিটব্যুরোকে!

জঙ্গলের ভেতর থেকে ভাসণ। নিয়মিত টিভি চ্যানেলে বাণী প্রদান। সেই সঙ্গে মিডিয়া হাইপ, তোল্লাই। প্রেতেরা প্রশ্ন করে, এ শালা মিডিয়া, টিভি - ডাণ্ডা, চোঙা সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে আর পুলিশ পারছে না জায়গা মতো যেতে, একীরকম ন্যাকড়া বাড়ি!

জঙ্গলে নিহত সবুজ উর্দি — যার ছবিটি কাগজে বেরয়, বাঁশের চৌদোলা নয়, একলা বাঁশ বাঁধা - অবস্থায় যার ডেড বডি বাইরে আসে ও মিডিয়া মারফত সকলে অবলোকন করে, সে খুব একটা মন্তব্য করতে চায় না এ ব্যাপারে। কারণ এখনও তার কাছে শ্রেণী রাজনীতি, শ্রেণী বোধ, শ্রেণী চর্চাই প্রধান।

'এক তাজমহল গড় হৃদয়ে তোমার আমি হারিয়ে গেলে...'

ষাট দশকের শেষ বেলায় পিন্টু ভট্টাচার্যের গাওয়া এই অতীব হিট গানটি বয়সের বেলা গড়িয়ে যাওয়া সেন্ট্রাল কমিটিকে মাঝে মাঝে রোদনাক্ত করে।

চোখে কেন যে জল আসে?

সে কি বেড়ে যাওয়া বয়স?

সে কি বিষাদ?

সে কি মৃত্যু ভয়?

জঙ্গল মনকে খেয়ে নেয়।

জঙ্গল চৈতন্যকে গ্রাস করে।

সন্ধ্যের পর ছক বাঁধা সেই গড় নৃত্য। গান। একঘেয়ে, যান্ত্রিত বছরের পর বছর একই জিনিস।

বন্দুক নিয়ে ট্রেনিং। ব্যায়াম। পলিটিক্যাল ক্লাস।

এত বড় দেশ। এত রকম মানুষ। তাদের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি বোধ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক— জীবনযাপনের তরিকা - সব

কত কত ভিন্ন।

গান গেয়ে ঐক্যের কথা বলে তাকে কী এক করা যায়?

অন্ধ্র থেকে আসা সেন্ট্রাল কমিটির আধিপত্য বাংলা বিহার ঝাড়খণ্ডের সেন্ট্রাল কমিটিদের বিরক্তির কারণ হয়। ভেতরে ভেতরে করে তোলে অসহিষ্ণু। কিনতু কিছু বলা তো যাবে না চট করে। সেখানে ইনার ডিসিপ্লিন, পার্টি শৃঙ্খলা, পার্টির রণনীতির প্রশ্ন, কমরেডশিপ।

বয়স বেড়ে যাওয়া বাঙালি সেন্ট্রাল কমিটি কখনও কখনও ঘুমের ভেতর নিজের গুলি বেঁধা, রক্তাক্ত মরা মুখ, আবছা মতো বডিও দেখতে পায়। বুড়ো হলে, নয়ত বার্ধক্যের কাছাকাছি এলেই জীবনের স্বাভাবিক অনেক কিছু গরহাজির হাতে থাকে। তার মধ্যে একটি ঘুম। আকণ্ঠ - আচক্ষু নিদ্রা। আহা ঘুম। ওহো ঘুম। সেই সঙ্গে যৌন মাধুরীও।

জঙ্গলের ভেতর এক ঘেয়ে গুনগুনানি শোনা যেতে থাকে—

‘জয় জয় সেন্ট্রাল কমিটি
জয় পলিটব্যুরো
জয় জয সর্বময় কর্তৃত্ব হে
জয় রেজিমেন্টেশান জয় দমনপীড়ন
জয় নিষ্ঠুরতা, খতমের ই-ই— ইয়ে...

কে শোনায় এইসব গান - কথা!

বাতাস শুনতে পায় দৈনিক, একঘেয়ে, এক সুরো সেন্ট্রাল কমিটি, পলিটব্যুরো স্তোত্র। বাঙালি সেন্ট্রাল কমিটি, বিহারি সেন্ট্রাল কমিটি সেব সব শোনার পরও তেলুগুভাষী সেন্ট্রাল কমিটিকে ভয় পায়। কারণ তার নিয়ন্ত্রণে পার্টির আর্মড স্কোয়াড, গুলি, বন্দুক। পি এন এ, পি এল জি, ক্লেমোর মাইন, ডিটোনেটার, আর ডি এক্স, বারুদ।

কেন্দ্রিয় কমিটি এখনও অস্ত্রনির্ভর।

কেন্দ্রিয় কমিটি এখনও সৈন্য নির্ভর।

যেমন কি না চিনের কমিউনিস্ট পার্টি, আজও। চিনের অক্টোবর বিপ্লবের বাষট্টি বছর পরেও। সেখানে পার্টি নেতৃত্ব রেড আর্মিকে সর্বদা নিজের নিজের কব্জায় রাখতে চায়।

এ সবই বুর্জোয়া অপপ্রচার।

এ সমস্তই শ্রেণী বিরোধী অপচেষ্টা।

এই সব কিছু শ্রেণী স্বার্থ, শ্রেণী রাজনীতি বিরোধী পলিটিক্যাল প্রোপাগাণ্ডা।

কারা বলে এসব কথা?

কারা উচ্চারণ করে এসব?

বনের বাতাস তখন স্তব্ধ।

কোনো কথা বলতে চায় না। জঙ্গুলে বাতাস। কেবল মূক অরণ্যের গভীরতর কোণে গুলি ফোটার নিষ্ঠুর শব্দ শোনা যায়। সোল্লাসে ফেটে পড়ে যেন কারা। গণ আদালত নিষ্পন্ন হইল। আর ক্লান্ত, বিষণ্ণ, পরাজিত রক্তের ধারা স্রোত এদিক - ওদিক, সেদিকে তাকাতে তাকাতে গড়িয়ে নামে ঘাসের ওপর, শুকনো পাতার গায়ে। ঘাসচরা সবুজ, নয়ত কালো পোকাটি টাটকা, গরম রুধিরের স্পর্শে শিউরে ওঠে। তারপর এক সময় রক্তমাখামাখি হয়ে গেলে তার তো গায়ের রংই বদলে যায়।

ভয়ে কুঁকড়ে এতটুকুন হয়ে যায় পোকাটি। সেই যে রাতে মাঠ সারতে আসা ন্যালাখ্যাপা আচমকা গ্রেপ্তার হওয়ার পর যেমন তার পুরুষাঙ্গটিকে কুঁকড়ে নিয়ে বাঁচার তাগিদে থাকতে চায়, তেমনই যেন পোকাটি।

শিলদার ই এফ আর ক্যাম্পের নিহত জওয়ানের প্রেত কখনও কখনও পাকি হয়ে তার বাড়ির উঠোনেই গিয়ে বসতে চায়।

‘...শ্মশানের নলো দগ্ধসি পরিত্যক্তসি বান্ধবৈ...’

পাহাড়ি জওয়ানের জন্য কি এই হিন্দু মন্ত্র থাকে? কিংবা ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সন্ধবঃ..৬’ ‘...ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু...।’

পৃথিবী মধুময় হোক, জগৎ সংসার মধু আর মধুতে প্লাবিত হোক...। এই প্রার্থনা কি রিঅ্যাকশানরি? শ্রেণী চৈতন্য, শ্রেণী বোধ বিরোধী?

কেন মধু সর্বজনভোগ্য হবে?

বুর্জোয়া, শোষক, মালিক, মহাজন, জোতদার - জমিদার কেন ভাগ পাবে মধুক্ষরা ঐশ্বর্যের। সবটা কেন যাবে না সাধারণ জন, গরিবগণের হাতে। এসব নিয়ে কেউ তর্ক করতেই পারে! এসব তো ঠ্যাটাতর্ক। যুক্তি বাদ দিয়ে অকারণ তর্কজাল।

শিলদা পুলিশ ক্যাম্পে নিহত সরকারি খাকী উর্দি বার বার পাখি হয়ে যেতে যায়। বহুবার উড়ে উড়ে পৌঁছনোর কথা ভাবে নিজের বাড়ি। সেখানে পাহাড়। সেখানে হয়ত কাঠের বাড়ি। সেখানে অন্য রকম অরণ্য, নদী।

পাহাড়ের থেকে গড়িয়ে নামা নদী স্রোত নুড়ি - পাথরদের ঠেলতে ঠেলতে ঠেলতে গোল্লাছুট খেলার সাইজে নিয়ে আসতে চায়। কখন, কোন সময়ে যে ঢল নেমে আসে পাহাড়ি নদীতে। এইসব বাড়ির উটোনে মুরগি থেকে কী! মোরগ? শুয়োর?

এই যে পাহাড়, বনস্থলী, তার সঙ্গে আর এক সরকারি খাকী উর্দির অরণ্য, খেত - খলিহন, মকাই, গেঁহু, গায়-ভঁইসের কোনো মিল নেই। শীতে কচি ভুট্টার দানা বড়ই স্বাদু, মিঠে— মনোহর। মাইনের দাপে খসে যাওয়া, উড়ে যাওয়া, পা, হাত, অন্ধকারের ছায়া ছায়া হয়ে আলাদা নাচতে থাকে।

আলগা হয়ে যাওয়া হাত, পা, হাতের আঙুল, পায়ের পাতা — সব উড়তে থাকে বাতাসে। উড়ন্ত সেই সব টুকরো

তালগোল পাকাতে পাকাতে দ হয়ে যায়। মাংসের মণ্ড, জ্বলে - পুড়ে যাওয়া মাংসের তাল উপগ্রহ হয়ে গোরে বায়ুমণ্ডলে।

প্রেত চিৎকার করে। প্রেতেরা সুবিচার প্রার্থনা করে।

হত্যা ও হননের যে রূপ মাকড়সা জাল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত প্রেতেরা যে রূপ ভাষা ব্যবহার করিতে চাহে, তাহা কী 'ভূমিপুত্র আখ্যানকারের' জানা? প্রেত ভাষা কী রূপ হইবে? তাহা কী লিখিত হইবে মান্য বাংলায়? অথবা কোনো আদিবাসী ভোকাবুলারিতে?

প্রেতেরা সন্দর্ভ পাঠ করিতে চাহে না। প্রেতের সহিত জীবিত জনের কোনো সম্পর্ক নাই! এই সত্য অথবা আপাত সত্য হৃদয়ঙ্গম করিবার পর ইন্দুরকুল শোভা মাণ্ডির মাংস ভোজে পুনরায় সাহসী পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে থাকে।

জঙ্গলে পরিত্যক্ত শহিদ বেদির উপর চন্দ্রের ফেনা মেঘসম মায়া বিস্তার করিয়া রহিয়া যায়। ব্যোমমার্গে অবলম্বনহীন শূন্যচারী টুপি, ব্যাজ, কফিন, গার্ড অফ অনারের বিউগিল, তিনরঙা পতাকা — স্যাটেলাইট সম দায়িত্বে সাদা ঘূণায়মান।

প্রেতেরা কী সমবেত ভাবে এতসব কারিকুরি, ক্যারিশমা দর্শন করিতে পারে? তাহাদের কী হৃদয়, মস্তিষ্ক, অনুভূতি — সবই রহিয়া গিয়াছে।

প্রথম প্রেত আমার টি শার্ট, জিনস, রাইফেল

দ্বিতীয় প্রেত আমার টুপি, ইউনিফর্ম, এস এল আর ব্যাজ

তৃতীয় প্রেত আমার ছাত্র-ছাত্রী, পেনশান, ক্লাস টিচারির দায়িত্ব, পার্টি অফিস, স্কুল বিল্ডিং, বৌ-ছেলেমেয়ে

চতুর্থ প্রেত আমার বিবাহ পূর্ব ও বিবাহ পরবর্তী সঙ্গতি, আমার বাড়ির সেগুন গাছটি, পোষা কুকুর, মুরগি, মা-বাবা—আমার স্তন বৈভব —

অন্য প্রেতের প্রেতযোনী স্তব্ধ।

প্রেতযোনিময় মনুষ্যকুল মহিষ পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে।

তাহারা কেহ কেহ সারমেয় বাহন,

ভূমি প্রেতদিগের ছায়া গ্রহণ করিত অপারগ।

মৃত্তিকা প্রেতছায়ার দায় সহিতে চাহে না।

প্রেতেরা বৃক্ষশাখে পদ সঞ্চারক পূর্বক রোমাঞ্চহীন, রহস্যহীন, মৃত্যুহীন।

অপার শূন্যে শশাঙ্ক শোভ অলৌকিক কুহকি মায়ায় সমাচ্ছন্ন।

প্রেত সকল বাকহীন কিন্তু কোনোভাবেই শব্দহীন নহে।

তাহারা গোঙায়।

গোঙাইতে গোঙাইতে মুখের ফেকো তুলিয়া ফেলে। এই প্রেত ঐক্যতানে পৃথিবী প্রকাশিত। মেদিনী টলমল।

কেন হিংস?

কেন অবাধ হন?

কেন মনহীন সন্ত্রাস?

প্রেতেরা কী এই সকল কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতে চাহিল?